KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ আষাঢ় ১৩২৮ শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good (✓ Brittle)
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কথিকা।

—:০:—

সাম্‌নের বাড়ি তিনতলা। তার জানালার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার একটা জালিকাজকরা ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

একদিন কলেজের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনমালীর চোখ পড়ল। বিশেষ করে চোখ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দু'জন নতুন লোকের ছবি ফুটে উঠেচে। তাদের একজন বিধবা প্রবীণা, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোল হবে, কি সতেরো।

সেদিন দেখা গেল সেই প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্চে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে।

আরেকদিন দেখা গেল চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি একলা বসে দিনান্তের শেষ আলোতে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের পিতলের ফ্রেম যত্ন করে আঁচল দিয়ে মাজ্‌চে।

তারপর দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা। কখনো বা কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছে; কখনো বা জাঁতি হাতে সুপুরি কাটে; কখনো বা স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোয়; কখনো বা বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেয়।

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্ বিমর্ষ হয়ে আসে। সেই সময়ে ঐ মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় একলা পা-মেলে কোনো দিন কোলে বই রেখে পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থম্‌কে থাকে, আর তার আঙুল যেন চল্‌তে চল্‌তে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম নিয়ে খেলা করছিল, আর আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছিল।

এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাঁকন। তার সাম্‌নের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির জায়গাটাতে মোটা সিঁদূর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্‌কা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে কখনো বা সকালে বিকালে ঐ বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে, যার থেকে বোঝা যায় ঐ সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুক্‌চে।

অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চল্‌চে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—মাঝে মাঝে দেখা যায় দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কলতলায়।

এম্‌নি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের

উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেচে, আস্তাবলের ধোঁয়া যেন অজগর সাপের মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্চে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি তার ঘরের জানালা খুল্‌ল, অমনি তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের বাড়ি ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তারপরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখ্‌লে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্‌সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগ্‌ল সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কালেজ খোল্‌বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সাম্‌নের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব কোথায় চলে গেছে।

বনমালী বলে উঠল, "যাক্, ভালই হয়েচে! স্বপ্নের বোঝার মত এমন বোঝা আর নেই!"

ঘরে গিয়ে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুল্‌লে না। একবার কেবল সেটা কেরোসিনের আলোর সাম্‌নে তুলে ধরে দেখ্‌লে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে এও তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুল্‌তে গেল, তারপরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্‌লে—"এ চিঠি কোনো দিন খুল্‌ব না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলে জঙ্গলে শীকার।

——:০:——

কলিকাতা, ২০শে অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শীকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদবী দেওয়া উচিত, তিনিই এ-রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ-রাজকীয় জাতির সংখ্যা ততো অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্যপ্রদেশ সকলে, তাদের নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন শ্বাপদজাতির বংশক্ষয়ের জন্যে শীকারীরাই বিশেষরূপে দায়ী; একথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সত্য। চতুষ্পদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের, যেমন হরিণমহিষের সংখ্যা, আমাদের দেশে এতই হ্রাস হয়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনারি বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনো নির্ব্বিচারে জীবহত্যা করে না; যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রলয় জোয়ান, আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শীকার যাদের ব্যবসায় আর জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করেনা, জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত

করবার জন্যে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক, তা নাহ'লে আমরা যে-সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, একএকটা শীকারযাত্রায় প্রায় তিনশত অনুচর সহযাত্রী হত—এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে-ধরণের বন্দুক ঘাড়ে করে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাম্বুতে ফিরতাম, তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে, আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক জন, ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে, বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত; যে হতভাগারা উত্তরাধিকারী সত্বে কিম্বা পয়সার জোরে এমন সব দানব-অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে নি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মত অমানুষিক চীৎকার করে, ঢিল পাট্‌কেল, বড় বড় পাথরের চাঙড়, ছুঁড়ে, গড়িয়ে, শীকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকর ছানা, সজারু—যাই পাশ দিয়ে যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এপর্য্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোরে; মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনোলোক যারা জঙ্গলের

অন্ধিসন্ধি খুব ভাল করেই জানে, তারা যে সময়ে-অসময়ে নির্ব্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শীকারী আমার মৃগয়া-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারল না; যে দিন আমি পৌঁছেছি, সেইদিন সকালেই সে এ মৃগয়া-রীতিবিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল; কথা ছিল খোঁজখবর করে, ব্যাঘ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন, তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে, শীকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামোছা, রক্তের জুলি, আর তার থেঁথ্‌লান অর্দ্ধেক-খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল। পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষখাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশেধরেরা করেছে।

খুব সম্ভবতঃ শীকারী একটি চিত্তল অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় আশায়, সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল,—মংলব, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে—ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শীকার করে ফেল্‌লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী, মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিলনা, কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শীকারীরা যেমন নির্ব্বিচারে বনরাজ্যে জীবহিংসা করে বেড়ায়, মনে হল বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এর প্রাণ নিয়ে তেমনি তারি প্রতিশোধ তুল্‌লেন। নর-মাংস আর

মৃগমাংসলোভী বাঘেদের কথা বলতে গেলে, বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও, একজাতীয়।

তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্য দশফুটের কিছু উপর (রোলণ্ড সাহেবের পরিমাপরীতি অনুসারে); শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ"। বঙ্গভূমির জলবাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়, তাই তারা দেখতে সহরের কাঙাল কেরাণীদের মত নয়, মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজারাজড়ার মত মেদমাংসবহুল, চালচলনও বিশেষ গম্ভীররকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শীকারের সন্ধানে শুধু মাঠে বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহগুলি, ক্ষিপ্রগতি রাজপুত বীরের মত দীর্ঘকায়, বসা মাংস-বর্জ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে সুঠাম সুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, দ্রুতগতি, সহসা তাদের শীকার করা কঠিন; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্ব্বেই, যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামলতৃণে সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহারবিহার করে' দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শীকার করে' করে,' ব্যাঘ্রবীরেরাও শীঘ্রই ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে ওঠে; তখন তাদের দিগ্বিজয়ী, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রঘুরাজ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপার নয়, অনেক পরিশ্রমই করতে হয়; হরিণ শূকর ভারি চতুর, পারতপক্ষে ধরা দেয়না, দিন গুজরান করতে অনেক মেহনত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আর হয়ে ওঠে না, কাজেই নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে নিতে

হয়। এঁদের সম্বন্ধে যা ব'ল্লাম, চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্র-রাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে, সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকার চর্চ্চা করতে আসে না, তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারচেষ্টায় দূরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে, যে রাজ্যে কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থসাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্রদেশই শ্রেয়। এ ছাড়া, দেশবিশেষে এই সব জন্তু বাস করতে একটু বেশী ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে, তিন তিনটা চিতা, তিন মাসের মধ্যে, উপরি উপরি, আমার গুলিতে মারা পড়েছিল।

এদের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ, আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশি, এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। তা নইলে পুরুষদের কাছে স্ত্রীজাতিকে খাটো করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমণি, তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই, নাহয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না! সন্তান পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশি সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধিখরচ, অনেক ফন্দীআঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে

না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন, সেই মৎলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড়সড় হয়ে যখন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনি তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয়, বেড়ালের মত বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মা তাদের অনাহারে, অনিদ্রায়, রাতদিন প্রাণপণ করে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম, কিছুতেই আর নাগাল পাই নে, তারপর সাবালক পুত্র-হত্যা-পাপের বমালসাক্ষীতেই সে বাঁধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে, সে দেখলে দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়েসে বড়, আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ, অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, করুণাময় পিতা আর তার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর ভোর-রাতে আমার কাছে পৌঁছল, কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না—এই ক'দিন ধরে ব্যাঘ্রবীরের তল্লাসে আমাকে ভারী হয়রান হতে হয়েছিল কিন্তু। বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল, বাবামশায়ের বুকে আর সে-টুকু সইল না—পুরুষব্যাঘ্র

ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়!

তোমরা মনে কোরনা বাঘ কিম্বা চিতা, জলের গোঁস নিতে চায় না; সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্যি, তবে দরকার হলে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ—যাঁদের সকলেরই সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত—আমায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে বাঘশীকারের সময় তাঁরা দেখেছেন—এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে, তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন, সে যেন ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে ঘাসেঢাকা মাঠ, তার চারদিকে হাতীর উপর শীকারী, এর মধ্যে কোন্ যাদুতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হ'ল না। ক্রমে আবিষ্কার হল মাঠের একধারে একটি খাল—বাঘটি টুপ্ করে তারি জলে নেমে, শুধু মাথাটি জলের উপর জাগিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে—সেই অবস্থাতেই সে মহারাজার—গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ, কিম্বা চিতা, যাই বল, (এদের মধ্যে আমিত কিছু প্রভেদ দেখি নে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে বনকোপে কোণ-ঠাসা হয়ে আটকা পড়েছিল, পালাবার পথ তার একটিমাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো-ধুতির মত কম-চওড়া একটা খুস্কি পথ, আমি তারি পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে, তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শীকারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে' পিটতে পিটতে আসছিল, আমি

একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—তখন আমার অবস্থা "পততি পততে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং" !—কিন্তু কৈ, কারো দেখা নেই—আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে, তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে, তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি; আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে, কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে অরণ্য-সম্রাট শার্দ্দূল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে জীবননদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে।—হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল, অন্য শীকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি, সন্তর্পণে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে, সে চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে,—শীকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে, সবে থমকে দাঁড়িয়েছে!

এমনও দেখা যায়, বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে, নদীর কিনারা পর্য্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল, তারপর ধারে ধারে অনেকদূর সাবধানে হেঁটে গেছে, নিরাপদ পারঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁতরে অন্য পারে গিয়ে, যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় ওঠা যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, তা সে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন করে নিয়েছিল।

এই সব নদীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা বিশ্বাস করা চলে না, তবুও হিতোপদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে, আমি যার কথা বলছি, তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল,—তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয় নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, জেলের জালে আট্‌কা পড়ে বেঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃত দেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শীকার পেয়ে তারা ভারী খুসি হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস চখাচখি, আর স্নাইপের মস্ত মেলা বসে যায়। কথায় বলে "গাঁ দেখ্‌বিত কলম, আর বিল দেখ্‌বিত চলন";—এ বিল সেই বিখ্যাত চলন-বিলের শাখা, এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চরে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময়, তখন আমরা ছেলেমানুষ, নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দই ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না, ফলারেবামন পাত পেতে বসে গেছেন; কর্ত্তারা ঘর-বার করছেন, এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গোয়ালারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে—একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িমাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে। এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে। তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দ্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুঁজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই, বিলগুলি মাঠ হয়ে

চাষবাস চলছে, মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গলে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে, বাঘরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকে, তবে ভিন্ন কারণে, (মানুষে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়!); আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নেমে আর উঠ্‌তে চাইনে, এও তেমনি আর কি।

(ক্রমশ)

পত্র।

—:※:—

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবুজ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে দু'একটি কথা, পাঠকদের তরফ হতে নিবেদন করছি। অবশ্য পাঠকমাত্রেই যে আমার মতের সঙ্গে সায় দিবেন, এমনতর প্রত্যাশা করি নে।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হল, তখন প্রবীণদের নিকট হতে যে ও পত্রিকা আশীর্ব্বাদ ও সমাদর লাভ করবে, সে দুরাশা অবশ্যই কেউ করেন নি; কিন্তু নবীনরা যে ওকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করবেন, সে আশাটা করা গিয়েছিল। ভরসা হয়েছিল আমাদের সামাজিক দুর্গতির দিনে এ পত্রিকাখানার পশ্চাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ সবুজ মনগুলি rally করে, মুক্তির গগনচুম্বী ধ্বজা এম্‌নি শক্ত করে তুলে ধরবে যে, নবারব্ধ crusade-এ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে পতাকা কখনো নামানো হবে না;—মুক্ত হাওয়ায় কম্পিত পতাকার তালে তালে স্বাধীন বক্ষের ভিতর সতেজ প্রাণগুলিও স্পন্দিত হতে থাকবে। সে আশা অনেকাংশেই ফলবতী হয় নি, কেননা তাহলে যাঁরা সবুজ পত্রের মতে subscribe করেন তাঁরা, একেবারে অক্ষম না হলে, পত্রিকাখানাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তা'তে

subscribe করতেন। গ্রাহকদের নিকট হতে একটু বেশি মূল্য পেলে, ও পত্রের পেট ভরলেও প্রাণ ভরবে না। অতএব পাঠকদের দিক থেকে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করছি।

বাংলা দেশের প্রায় কোনো পত্রিকারই একটা বিশেষ ভঙ্গী নেই। একখানা পত্রিকাকেই হরেকরকম মনের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয় ;—যে ভাবতে চায় তাকে ভাবাতে হয়, যে কাঁদতে চায় তাকে কাঁদাতে হয়, যে হাসতে চায় তাকে হাসাতে হয়, তদুপরি আর্টগ্যালারি খুলতে হয়, এবং স্বরলিপি সরবরাহ করতে হয়। সাতমিশালি রং সাদা হতে বাধ্য, কাজেই আমাদের দেশের অনেক পত্রিকারই, ওজন কিংবা পরিমাণ যতই থাকুক, রঙের অভাব বড় বেশী। অবশ্যই এ অবস্থার জন্য আমাদের যে দারিদ্র্যই অংশতঃ দায়ী তা অস্বীকার কচ্ছি নে, কেননা একাধিক পত্রিকা নেবার মতো সঙ্গতি আমাদের দেশের বেশি লোকের নেই ; কিন্তু এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কোথায় আমাদের মনের সেই দুর্নিবার পিপাসা, যার দুরন্ত তাগিদে নব নব বার্ত্তা নিয়ে নব নব পত্রিকার অভ্যুদয় হবে ? কোথায় সে চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, যার সাহায্যে আমাদের মনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ? আমাদের মনের বিশিষ্টতা থাকলে, পত্রিকারও থাকত। পাশ্চাত্যে যে তা আছে তার প্রমাণস্বরূপ, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, এমন অনেক কাগজের নাম করা যেতে পারে, যা বহুকালাবধি কোন বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ধারা বিতরণ করে জনসাধারণকে পরিপুষ্ট করছে, এবং নিজেও পরিপুষ্ট হচ্ছে।

সাতমিশালি সাদা রং থেকে—সৌর-কিরণ যে সাতমিশালি তা

সকলেই জানেন—সবুজ রংটা বের করে চোখে পড়িয়ে দেবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, তার কারণ আমি যা বুঝতে পারছি তা এই যে, সাদা আলোয় গন্তব্যস্থানটা সুস্পষ্ট করে, আর সবুজ আলোয় তা ঝাপসা হয় ; আবার সবুজ আলোয় নৃত্য করবার যদি একটু প্রবৃত্তি হয়, সাদা আলোয় তা নিবে যায়। নৃত্যশিল্প আমাদের নয়,—পাশ্চাত্যের ; আর বাঙালী যুবক বায়োস্কোপে Shackelton Expedition-এর ছবি দেখতে যতই ভালোবাসুক, একটি স্থান ব্যতীত অপর কোন ঝাপসা জায়গায় লাফিয়ে পড়তে সে একান্তই নারাজ। সে স্থানটি হচ্ছে বিবাহ-বাসর। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তুটি আহার ও পানীয় সরবরাহ করবার উপযুক্ত হলে, সে আর কিছুর জন্যই কেয়ার করে না। এরূপ ঝাপসার প্রতি সংস্কারগত অনুরাগ সম্ভবতঃ আমাদের জাতির কবিত্বের প্রমাণ। এ অবস্থায় যাঁরা পাটেল বিল সমর্থন করছেন তাঁরা যে পাট্‌কেল পাচ্ছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সরকার বাহাদুর যদি পাটেল বিল তুলে না নেন, তবে পাটেল বিলের বিরোধীরা যে পটল তোলবার কাছাকাছি যাবেন, তা অসম্ভব নয়। কেননা উক্ত বিল যে শুধু অসবর্ণ বিবাহ আইন সিদ্ধ করবে তা নয়, নরনারীর পূর্ব্বরাগকেও প্রশ্রয় দেবে এরূপ আশা করা যেতে পারে ; কারণ যাঁরা বিবাহ করবেন তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিলের স্মরণ গ্রহণ করবেন,—যাঁরা বিবাহ করাবেন তাঁরা নয় ; এবং যাঁরা এরূপ বিবাহ করবেন, তাঁরা পরস্পরকে দেখেশুনেই বিবাহ করবেন।

যাঁরা বিবাহ নামক এত বড় ঝাপসা জিনিসটিকে এক মুহূর্ত্তে আয়ত্ত করে ফেলবার অমানুষী শক্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই আবার অপর কোন ঝাপসা জিনিস দেখলে যে একদম পিছ-পা হয়ে পড়েন কেন, তা

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন। সবুজ পত্র যে পথ দেখাচ্ছে সে, পথে অগ্রসর হলে কোথায় গিয়ে পড়ব তার ধারণা আমার নেই, অথচ দশের পথে চললে কোথায় গিয়ে পৌঁছব তা বিলক্ষণ জানা আছে ;—সে হচ্ছে যেখানে রয়েছি, সেখানেই। ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পানে ছোটবার পরিণাম হিতোপদেশে দেখেছি। অতএব সবুজ পত্রের আহ্বানে কর্ণপাত করবার যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণিত না হলে, যুবকবৃন্দ যে অমনি অমনিই অকূলের পানে ছুটে চলবে, এমনতর প্রত্যাশা আমাদের দেশে করা চলে না।

মানবজীবনের লক্ষ্য কি ?—এর জবাব নিঃসঙ্কোচে দিতে পারেন, এমন স্পর্দ্ধা যে কেউ রাখেন না, তা জোর করে বলা যেতে পারে। অবশ্যই "ধরি মাছ, না ছুঁই পানী" নীতির অনুসরণ করে "যা ভালো তা-ই লক্ষ্য" জবাবটা দেওয়া চলে। দার্শনিকেরাও দেখতে পাচ্ছি হোঁচোট খেতে খেতে সৃষ্টির লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ নিরাপদ উত্তরটিই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দার্শনিকদিগের মুখব্যাদান দেখে, এর পরে পাঠকেরাও "ভালো"র মানে সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করবার ভরসা পাচ্ছেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রশ্নটি দুরূহ হলেও, মীমাংসা করবার চেষ্টা অবিশ্রাম চলেছে ; কেননা মীমাংসাটা এতই জরুরী যে, এর একটা কিনারা না হলে জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপ অর্থহীন বলে মনে হয়। এথিক্‌সের স্তূপাকার পর্ব্বত ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে, এবং মানবের এ চেষ্টারও যে কোনকালে অবসান হবে, এমন লক্ষণ মোটেই দেখা যাচ্ছে না ;—কেননা দিনের পর দিন মানুষের "angle of vision" বদলে যাচ্ছে।

এই ভাঙাগড়ার ভিতর বাঙালী জাতির আদর্শটি চিরস্থির রয়েছে বলে যে গর্ব্ব করা হয়ে থাকে, বিশ্বের মাপকাঠিতে সে গর্ব্বের মূল্য নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—যেটা এতদিন আবশ্যক হয় নি, আজ হঠাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ল কেন ? উত্তর নিতান্ত সোজা। ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম—এ গুলির প্রায় সব ক'টিকেই জয় করে মানবজাতি দেশ দেশান্তরে অবাধে যাতায়াতের পথ একেবারে উন্মুখ করেছে। পূর্ব্বের ন্যায় জীবনসংগ্রাম আর দেশখণ্ডে আবদ্ধ নয়,—একেবারে বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হলে আমাদের কয়েকটি রত্নকে যে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, এমন কোনো যথার্থ হিতকামী সমাজ সংস্কারক নেই, যিনি তা অস্বীকার করেন। তবে এখন কেন নূতনের আবশ্যকতা বেশি, যাঁরা "অরণ্যের বাণী" পড়েছেন তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, এবং ওর চেয়ে সুন্দর করে বোঝানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে, সকল চিরাগত সংস্কারের স্তূপীকৃত জালজঞ্জাল আমাদের একেবারে চেপে রেখে এক পা'ও অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সে গুলোকে আর কতকাল এমনি করে পোষণ করে রাখব ?

একটা প্রচণ্ড জবাব প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, মনু পরাশর যে-সকল ধারা গভীর চিন্তার ফলে প্রণয়ণ করলেন, কার এরূপ স্পর্দ্ধা যে স্বীয় সীমাবদ্ধ তর্ক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে-সকল ধারার সমীচীনতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ?—যুক্তিটি যে প্রবল তা মানতেই হবে ! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানুষের ব্যক্তিত্বকে অপমান করে যিনি ভাববার ও চিন্তবার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তাঁকে

তর্ক করে বোঝাবার দুঃসাহস সম্ভবতঃ কেউ রাখেন না; তবে তাঁর পক্ষে একথাটি মাঝে মাঝে স্মরণ করা সম্ভবতঃ শক্ত হবে না যে, যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে কিছুমাত্র সত্য ও সৌন্দর্য্য দান করেছেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—

"যাঁরা সবল, স্বাধীন,
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্য জ্যোতিষ্মান,
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ,

* * * *

কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করিছেন ভেদ।"

যাঁদের চোখে সত্যের শুভ্র আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নি, যাঁরা সুমুখ হতে বিচারপ্রবৃত্তিকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে জীবনযাত্রাকে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট করেন নি, অথচ সমস্ত হৃদয় দিয়ে সত্যকে আহ্বান করবার শক্তি হতে বঞ্চিত; আশা করা যেতে পারে তাঁদের sophistry-র মৃদু-গুঞ্জন সবুজ পত্রের মর্ম্মর কলতানের নীচে চাপা পড়ে যাবে।

যে sophistry-র বিষয় উল্লেখ করা গেল তা যে মনঃকল্পিত নয়, তা দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। কোন এক স্থলে সামাজিক কুসংস্কারকে প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, তাতে অস্ত্রপ্রয়োগ করলে যেমন প্রাণীর

মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমনি আবহমান যে সকল কুসংস্কার চলে আসছে, অর্থহীন হলেও তাদের উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করলে সমাজ-শরীর একেবারে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অতএব কি জীবদেহের Vestigal organ, কি সামাজিক কুপ্রথা—উভয়ের তিরোধানের জন্য নীরবে অপেক্ষা করাই বিজ্ঞজনোচিত। আর এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, evolution একটি একটানা ঊর্দ্ধগামী ব্যাপার নয়;—মোটের উপর তার গতি উন্নতির দিকে হলেও তাকে উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, ঢেউয়ের মতো, অগ্রসর হতে হয়। অতএব সমাজ-শরীরের কোন সাময়িক দুর্গতি দেখে ভয় পাওয়া অনুচিত, কেননা তা evolution-নিয়মের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কালের উপর বরাত দিয়ে সহিষ্ণুতার দাবী করা অবশ্যই সে জাতির পক্ষে শোভনীয়, যে জাতির অপরিসীম ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় বালবিধবার দুঃসহ নির্জ্জলা উপবাসে ও লাঞ্ছিত পত্নীর নীরব অশ্রুপাতে।

জীবদেহের সহিত সামাজের সাদৃশ্য যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাতে দু'একটি কলমের খোঁচায় তাকে টলানো সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে এ সাদৃশ্যের শাখা-প্রশাখার ঘননিবিড় ছায়াকে আশ্রয় করে কোন কোন অর্থহীন সংস্কার নির্ব্বিবাদে বসবাস করছে। উদার আকাশের শুভ্রআলোক তাদের উপর পড়লে তারা পালাবার জন্য ছুটোছুটি করে মরতো। প্রাচীন সংস্কারের সে কালিমা সামাজিক বন্ধুরতার উপর ছায়া ফেলে জীবনযাত্রার পথ অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব রকম ঋজু করে ফেলেছে।

উপমা জিনিসটি কাজ করে চমৎকার ততক্ষণ, যতক্ষণ ওকে ওর

সীমানার মধ্যে আট্‌কে রাখা যায়। উপমার কাজ হচ্ছে জটিল বিষয়কে বুঝিয়ে সহজ করা ;— যুক্তির point বের করা নয়। ভূমণ্ডল কমলা-লেবুর মতো দু'দিক চাপা বলে, উক্ত ফলের ন্যায় টক বা মিষ্টি নয়। মনুষ্যদেহকে ব্যঙ্গ করে forked radish বলা হয়েছে বলে, উক্ত দেহ মূলোর মত মাটি ফুঁড়ে নির্গত হয় না।

সমাজমন বলে যে বস্তুতঃ কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই, তা আপনি পূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই বলেছেন। Social organism জিনিষটিও যে আকাশকুসুমের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয়, তা বুঝতেও বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। লেখক Sir Leslie Stephen বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে যোগ (abiding unity) থাকে, সমাজের ভিতর সেরূপ কোন যোগ নেই, যার জন্য তাকে social organism বলা চলে ; তিনি তৎ-পরিবর্ত্তে social tissue শব্দটি প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আমাদের সামাজিক দুর্গতিকে যে উক্তপ্রকারে সমর্থন করা চলেনা, তা বলা বাহুল্য।

আসল কথা হচ্ছে যে, মানসিক জড়তার পরিমাণটা যখন বেশি হয়ে ওঠে, তখন যুক্তিধারার গতিটাও স্বচ্ছন্দ থাকে না ;—ব্যাধিভারে ঋজু হয়ে চলতে না পেরে তাকে বেঁকে চলতে হয়।

সত্য হচ্ছে আলোক—মনের searchlight। সে আলোক এত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, যার উপর সে আলোক পড়ে তা একমুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মতো উন্মুক্ত, নির্ভীক, সরল দৃষ্টিতে তাকানো চাই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সেই সহজ দৃষ্টির অভাবে সোজা জিনিষও বাঁকা হয়ে যায়। বিখ্যাত "সহজ"

পন্থী Charles Wagner সহজের গুনকীর্ত্তন করতে করতে বলেছেন—

Too many hampering futilities separate us from that ideal of the true, the just and the good, that should warm and animate our hearts. All this brush-wood, under pretext of sheltering us and our happi-ness, has ended by shutting out our sun. When shall we have the courage to meet the delusive temp-tations of our complex and unprofitable life with the sage's challenge : "Out of my light" ?

চির অভ্যস্ত পথে বাঁধি-বোল আউড়ে চলা সোজা হলেও, সেটা সহজ অবস্থা নয়। "সোজা" আর "সহজ"—এ দুয়ের পার্থক্য বোঝানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। তপঃপরায়ণ ঊর্দ্ধবাহুর অভ্যস্ত অবস্থাটি যতই সোজা হোক্, ওটি যে তার সহজ অবস্থা নয়, তা বলা বাহুল্য।

সেই সহজ পথ আবিষ্কারের নিমন্ত্রণ নিয়ে সবুজ পত্র আবির্ভূত হয়েছে। Brushwoodগুলি কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে, ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে সত্যশিবসুন্দরের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে এবং চিরকাল চলবে ;—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। হঠাৎ চলা থেমে গেলে কি দুর্গতি হয়, আমরা সবুজ পত্রের পাতাতেই অনেকবার তা জানতে পেরেছি। তাইতো লেখা হয়েছে—

"যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ
বস্তুর পর্ব্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।"

মানবসভ্যতার এমন একটি স্তর নেই যেখানে পৌঁছলে বলতে পারা যায় "Thus far and no further।" কি মনোজগতের, কি জড়জগতের, সব চেয়ে যে ধর্ম্মটি সত্য, তা হচ্ছে চলার ধর্ম্ম। সৃষ্টি লীলার গোড়ার কথাটিই গতির কথা, তাই বলা হয়েছে "Action was the beginning of everything," এবং এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেই দার্শনিকরা causality-কে category-র অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বোধটি পরিবর্ত্তন-বোধ অর্থাৎ গতি-বোধ হতেই উদ্ভূত।

অতএব সবুজ পত্রের কাছথেকে যে চলবার আহ্বান আসছে, তাতে কর্ণপাত না করে যিনি আভিজাত্যগর্ব্বে চণ্ডী-মণ্ডপের স্তম্ভটাকে আশ্রয় করে স্থাণু হয়ে বসে থাকবার প্রত্যাশা করেছেন, তাঁর প্রতি নিবেদন এই যে, একদিন প্রত্যূষে যখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন যে স্তম্ভটা অন্তস্তলে কীটদষ্ট হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, এবং সে স্থানের মাটি ফুঁড়ে এক লক্ষ্মীছাড়া আগাছা অলক্ষিতে নির্গত

হয়ে তার কণ্টকাকীর্ণ দেহখানি সঞ্চালিত করে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে,—তখন যেন তিনি অদৃষ্টকে ধিক্কার না দেন।

সংস্কার-কার্য্য নানা প্রকারে চলতে পারে,—ধর্ম্ম প্রচার করে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করে, মিশন স্থাপন করে, ইত্যাদি ; কিন্তু এ সকল সংস্কার সে-পরিমাণে সার্থক হবে, যে পরিমাণে তাদের গ্রহণ ও প্রচার করবার পক্ষে জনসাধারণের মন অনুকূল হবে। অতএব গোড়ার কথাটা হচ্ছে মনের সংস্কার। সেই সকলের-সেরা সংস্কার অর্থাৎ একেবারে vital point-এ হস্তক্ষেপ করেছে বলে সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত। ইতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

ইঙ্গ সবুজপত্র।

—*—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

আজ তোমাকে একটি সুখবর দিচ্ছি।

সবুজপত্র এতদিনে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে, ইঙ্গ-বঙ্গ দল থেকে আর একটি তরুণ সবুজপত্র বেরিয়েছে, যার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র যেমন আধ-পাকা, তেমনি আধ-মরা। এই নবপত্র প্রথমত আকারে ছোট, দ্বিতীয়ত ইংরাজিতে লেখা। তালপত্রের চাইতে তেজপত্র যেমন ঝাঁঝালো, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়,—বাঙলা সবুজপত্রের চাইতে ইংরেজি সবুজপত্র তেমনি বেশি ঝাঁঝালো, তেমনি বেশি দড়।

তা ত হবারই কথা। কে না জানে বাঙলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সেই তফাৎ, দেশী ওষুধের সঙ্গে বিলেতি ওষুধের যে তফাৎ। লোকে বলে আলোপ্যাথি হচ্ছে ফৌজদারী চিকিৎসা, ও কবিরাজি—দেওয়ানি। অর্থাৎ কবিরাজের হর সয়, ডাক্তারের সয় না। কবিরাজ রোগ জিনিসটিকে মুলতবি রাখতে জানে, তারপর তার চিকিৎসার আপিল আছে, খাস আপিলও আছে, এমন কি শেষকাণ্ডে হোমিওপ্যাথি নামক বিলেত আপিলও আছে।

ডাক্তারের কিন্তু সব তড়িঘড়ির ব্যাপার। আলোপ্যাথি যেমন-তেমন

ফৌজদারী আদালত নয়, একেবারে Martial Law Tribunal,—সেখানে মানুষ পায় হয় বেকসুর খালাস, নয় প্রাণদণ্ড—যার উপর আর আপিল নেই। এ ছাড়া আরও মিল আছে। ইংরেজি ওষুধ সব কটু কষায়, তারপর যেমনি স্বাদ তেমনি গন্ধ। কুইনিন আর কেস্টরঅইল হচ্ছে ডাক্তারখানার সেরা ওষুধ। আর তার গন্ধ স্পর্শ রসের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ইউরোপের ধারণা—যে-বস্তু ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে, সে-বস্তু শরীরকে অনুগ্রহ করতে বাধ্য। আমাদের ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার করলে আত্মার উপকার হয়, কিন্তু দেহের হয় অপকার। আমাদের ওষুধের নাম শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়—যথা রসসিন্দুর, স্বর্ণপর্পটি, মৃক্তাভস্ম, মকরধ্বজ ইত্যাদি। তারপর এদের যেমন নাম তেমনি চেহারা,—কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি শুকশ্যাম, কোনটি হিঙ্গুলপারা; সব চিক্‌চিক্ করছে, চক্‌চক্ করছে, দেখবামাত্র মন নেচে ওঠে। ইংরাজিতে যাকে বলে love at first sight—কবিরাজি ওষুধের উপর চোখ পড়ামাত্র সকলেরই সেই মনোভাব হতেই হবে। তারপর দেশী ওষুধের অনুপান আছে, বিলেতি ওষুধের নেই। আর সে অনুপানের বালাই নিয়ে রোগীর মরতে ইচ্ছে যায়। স-মধু মরিচের গুঁড়া, মিছরির সরবৎ ও জামিরের রস, পানের রস প্রভৃতির সংযোগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পান করা যায়, লেহন করা যায়, চিবোনো যায়, চোষা যায়। সমাজদেহকে রোগমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সবুজপত্র কবিরাজীর আশ্রয় নিয়েছেন—আর ইংরেজি সবুজপত্র মায় সার্জ্জারি আলোপ্যাথির। মহাকবি রাজশেখর সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন, ইংরেজির সঙ্গে বাঙলার প্রভেদও তাই। সুতরাং তাঁর

ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, ইঙ্গ সবুজপত্র হচ্ছে "পুরুষ-পরুষ", আর বঙ্গ সবুজপত্র "মহিলা-সুকুমার"।

এরূপ হবার কারণও আছে। বল্‌তে ভুলে গিয়েছি যে, এই নবপত্রের নাম হচ্ছে Bulletin of the Indian Rationalistic Society। এই নামই প্রমাণ যে, এ পত্র বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া আর কিছুই মানে না। যেমন আলোপ্যাথির, তেমনি এ সাহিত্যের ভিত্তিই হচ্ছে Biology, Physiology, Botany, Chemistry প্রভৃতি। যে কোন সামাজিক সমস্যা উঠুক না কেন, এ পত্র এর একটি না একটির সাহায্যে তার হাত হাত মীমাংসা করে দেবে। অপর পক্ষে বাঙলা সবুজপত্র নিঙড়ে কি বেরবে?—কিঞ্চিৎ কাব্যরস। আর হামান-দিস্তেয় কুটলে?—কিঞ্চিৎ দর্শন-চূর্ণ। এবং এ দুয়েরই অনুপান হচ্ছে—হাস্যরস। খোঁজ নিয়ে দেখ বাঙলা সবুজপত্রের লেখকমাত্রেই সেই শিক্ষায়, শিক্ষিত ইংরেজিতে যাকে বলে literary education; আর ইংরেজি সবুজপত্রের লেখকেরা সব বিজ্ঞানবিৎ। শুনতে পাই যে, ইউরোপের জনৈক মহা-দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবীতে আগে আসে কাব্য, তারপরে দর্শন, আর সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইংরেজি সবুজপত্রের আবির্ভাবের পর বাঙলা সবুজপত্র যে পিছনে পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে পত্র মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই লড়াই সুরু করে দিয়েছে, সে পত্রের আর মার নেই,—অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। আমি এই নবোদ্গত পত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি শতায়ুঃ হও, আর তোমার ইম্পাতের দোয়াত কলম হোক।

(২)

এখন এ পত্রের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মনে আছে যে পাটেল-বিল নিয়ে দেশে যখন একটা পণ্ডিতের তর্কের সুরু হয়, তখন সনাতনপন্থীর দল অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষে eugenics নামক একটি নেহাৎ কচি ও কাঁচা বিজ্ঞানের দোহাই দেন। সে দোহাই আমরা অমান্য করতে পারি নি,—কেননা বিজ্ঞানকে আমরা রাজার মত মান্য করি এবং রাজার মতই ডরাই। তারপর এই নব সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে eugenics-এর ব্যাখ্যান পড়ে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল,—পণ্ডিত ম'শায়েরা পড়লে তাঁদের মস্তকের শিখা যে যথার্থই অর্কফলা হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। Eugenics-এর বাঙলা জানিনে, কিন্তু তার একেলে সংস্কৃত হচ্ছে সু-জনন বিদ্যা। এ বিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্রমতের অর্দ্ধেক মিল আছে—কিন্তু বাকী অর্দ্ধেকের ফারাক আশমান-জমিন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ সত্য সুজনন-শাস্ত্রীরাও মানেন; কিন্তু "পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্", এ বচন শোনামাত্র এ শাস্ত্রের সিংহব্যাঘ্রেরা মহা গর্জ্জন করে উঠবেন, এবং এ কথা যারা মুখে আনে, তাদের পিণ্ডি চট্‌কাতে প্রস্তুত হবেন।

এঁদের মত হচ্ছে "পুত্রষণ্ড প্রয়োজনম্"—কেননা তার কৃপায় জাত আপনাহতেই বড় হয়ে উঠবে, উঁচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের ছেলেমেয়েরা সব সুজন ও সুজাতা হয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। এ বিজ্ঞান নরনারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখে না, দেখে শুধু জনক জননী হিসেবে; সুতরাং আমরা যাকে বিবাহ বলি, এ মতে সে হচ্ছে

শুধু জোড়কলম বাঁধবার হিসেব। যে শাস্ত্রমতে গৌরীদানের মাহাত্ম্য গরুদানের চাইতেও বেশি, সেই পুরোনো শাস্ত্রের হিসেবের সঙ্গে এই নতুন শাস্ত্রের হিসেবের যে কোনও মিল নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এদেশে কোন কথাই বলা বাহুল্য নয়। অতএব উক্ত পত্র হতে শ্রীযুক্ত আর, সি, মৌলিক মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত আর একটি প্রবন্ধ হতে ক'ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Putrarthhé kriaté varjya"

(One marries a woman for begetting sons). Poor little thing! She is forced into the bed of a hulking youth, and he inculcates on his "phantom of delight" on the propedeutics of the metaphysics of love, inside a comfortable curtain. Before reason and judgment gather strength, before any principles are formulated, the epitheumetic impulses are precociously provoked, by the presence of an object calculated to inflame them, and the shameful connivance of an agent interested in their premature development".*

এর চাইতে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে?—এর লক্ষ্য এত সিধে আর এর বেগ এত বেশি যে, এ কাগজের নাম Bulletin না হয়ে Bullet হওয়াই উচিত ছিল!

* Bulletin of the Indian Rationalistic Society. Vol I. No 3. p. 43).

(৩)

এই বিজ্ঞান-তান্ত্রিক বীরাচারীদের শাস্ত্রের কারবার যে শুধু রক্তমাংস নিয়ে তা নয়—তাঁরা মাদক দ্রব্যেরও সন্ধানে ফেরেন। এঁরা চতুর্ব্বেদ ঘেঁটে সোম যে কি পদার্থ, তার পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছেন। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা এক সঙ্গে সুরা ও সোম পান করতেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই স্বস্তি বচন পাঠ করতেন—

"ওহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক
পৃথকরূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন।
তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা
আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

সেই অবধি সুরা ও সোম যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান আমারও ছিল; কিন্তু সোম জিনিষটি কি, তার সঠিক খবর আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। এই নবপত্রের একটি অশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে আবিষ্কার করলুম যে, সোম রসায়নের অধিকারভুক্ত নয়—ও পদার্থ হচ্ছে আসলে ভেষজ, যাকে আমরা স্থরিতানন্দ বলে থাকি। কিন্তু এতে আমার মনে একটু খট্‌কা লগল। আফিং ও মদ যে জুড়িতে চালানো যায়, সে ত সকলেরি দেখা-সত্য। এবং এ জুড়ি কদম কদম চলেও ভাল,

যেহেতু এর একটি আর একটিকে রোখে, ছারতকে উঠতে দেয় না। তবে গঞ্জিকা ও সুরার ত এরকম জুড়ি মেলানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একসঙ্গে এ দুয়ের এস্তমাল করলে মানুষে যে "বুঁদ হয়ে যাবে, বোঁ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে"! রস-তত্ত্বের পারদর্শী আমার জনৈক ন্যাসনালিষ্ট্ বন্ধু কিন্তু আমার এ সন্দেহের নিরাস করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মত মানুষ হলে, সে নিজ মস্তিষ্কে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করতে পারে, আর আমাদের বৈদিক পিতামহেরা, অর্থাৎ সত্যযুগের তাঁরা ত মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সব demi-god, সুতরাং তাঁদের পক্ষে উক্ত উভয় রস যুগপৎ অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করাটা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, দেবতারা যে নন্দন কাননে চির-আনন্দে বাস করেন, সে একমাত্র কল্পতরুর প্রসাদে; কেননা কল্পতরু হচ্ছে সেই গাছ —যার পাতা সিদ্ধি, ফুল গাঁজা, ফল ধুতুরা, আঠা আফিম, ছাল চরস, রস মদ, আর শিকড় কোকেন। একথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বল্‌লেন—"তুমি ভাবছ যে এমন গাছ থাকতে পারে না, যাতে এই সকল তেজস্কর দিব্য পদার্থ একাধারে পাওয়া যায়? অমরাপুরীর কথা ছেড়ে দাও, যদি Botany জানতে তাহলে এ সত্যও জানতে যে, এই ভারতবর্ষেই এক গাছ আছে, যার পাতা হচ্ছে পান, ফুল জয়িত্রী, ফুলের বোঁটা লবঙ্গ, কুঁড়ি এলাচ, ফল জায়ফল, ছাল দারচিনি, আঠা খয়ের, আর শিকড়চূর্ণ চুন"। আমি বিজ্ঞানকে রাজার মত মান্য করি ও রাজার মত ডরাই, সুতরাং ঐ botany-র দোহাই দেবামাত্র আমি বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলুম যে, সোম হচ্ছে স্বরিতানন্দ।

তবে ও বস্তু সিদ্ধি কি গাঁজা, সে বিষয়ে আমার মনে এখনও ধোঁকা রয়েছে—কেননা গঞ্জিকা মানুষে গুলে খায় না, টানে। অতএব আমি ধরে নিচ্ছি যে, সোম হচ্ছে সিদ্ধি। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে সকলকেই মানতে হবে যে বঙ্গ সবুজপত্রের রস হচ্ছে সোমরস। সিদ্ধির পাতার সঙ্গে উক্ত পত্রের দুটি জবর মিল আছে। প্রথমত ও দুয়েরি রঙ সবুজ, দ্বিতীয়ত ও দুয়েরই রস পান করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। অপরপক্ষে ইঙ্গ সবুজপত্রের রস যে সুরা, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—কেননা ও হচ্ছে একদম বিলেতি মাল। অতএব আমাদের যুবকসম্প্রদায় যদি এই উভয় সবুজপত্রের রস একাধারে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে পান করতে ব্রতী হন, তাহলে প্রমাণ হবে যে তাঁরা সব সত্যযুগের লোক; এবং তাও আবার যে-সে লোক নয়—একদম ক্ষত্রিয়।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রার্থনা শুধু এই যে—

"ওহে সুরা ও সোম! তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

এ প্রার্থনা যে কতদূর সঙ্গত, দুকথায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুরা যে তেজস্বিনী, এ কথা জগৎবিখ্যাত, আর স্বরিতানন্দ রাজার নেশা না হলেও নেশার রাজা। তারপর দেবগণ সত্যসত্যই এ দুয়ের জন্য পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করেছেন। সিদ্ধির গন্তব্য স্থান হচ্ছে cerebrum এবং সুরার cerebellum—অর্থাৎ এর একটি হচ্ছে জ্ঞানমার্গের, আর একটি কর্ম্মমার্গের নেশা।

এরা যদি পথ ভুলে এ ওর আর ও এর ঘরে গিয়ে ঢোকে, তাহলে মনোরাজ্যে যে কি উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তা সকলেই আন্দাজ করতে পারেন। আর এ দুটি যদি মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে এর রসে আর ওর রসে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য।

বীরবল।

২৪শে অগষ্ট, ১৯১৯।

ঝুপ্ ঝুপ্-চুপ্।

——:*:——

(ঢাকা—মাণিক গঞ্জের মৌখিক-ভাষায় লিখিত)

আষাঢ় পার হৈয়া শাওন মাস পৈরচে, ঝিনই বিলের মাঠখান জলে নৈদাকার। আগৈর খ্যাতের আউসধান পরায়ই কাটা হৈচে, নামী খ্যাতের পাকা ধানের কালা কালা বাইল(১) গুলা তল হৈতে হৈতে কোন মতে জলের উপর জাইগা রৈচে মাত্র। তামান দুফুর গুরানি বিষ্টির পরে শেষ বেলার নিভাজ(২) আকাশে রুগীর মুখে হাসির সলকের(৩) রকম একটুখানি রৈদের জিল(৪) দেখা দিচে; তাতে আশার থিকা আশঙ্কাই হৈতাচে বেশি। তির্‌তিরা হাওয়ায় জলের থলি চাক্‌লা(৫) জুইরা চেলা-ঢেউ(৬) উঠ্‌চে। মাঠের ইখানে-ওখানে গিরস্তগোরে পারা-গাড়া(৭) ডিঙ্গি নাও। কোন কোন নায়ের লগির মাথায় চাষালোকের শুকাব্যার-দেওয়া খাট-বহরের কাপর নিশানের রকম বান্ধা। বেবাক নাও খালি। চাষারা সকলেই জলে খারায়্যা ধান কাটত্যাচে; আইজ কেউর মুখ দিয়াই ভাইটাল গানের সুর বাইরয় নাই। সগলেই বাড়ন্ত জলের জোয়ারের মুখে থিকা

(১) শীস্। (২) পরিষ্কার। (৩) আলোর রেখা। (৪) রশ্মি। (৫) সীমা। (৬) ক্ষুদ্র। (৭) বাঁধা (anchored)।

আপন আপন বছরকার মিহানতের ধন—পাকা আউস, ছিনায়্যা রাখনে ব্যস্ত।

চাইরদিগের থৈ থৈ জলের পুবপারে সেওরাতলি গাও। মাঠের মধ্যিখান থিকা দেইখ্‌লে মনে হয় য্যান গাওখান জলের উপর ভাস্‌ত্যাচে। ধনুকের মতন গাছের একটানা ব্যাকা(১) একটা সাইর(২), তারি আবডালের নীল ফাসা(৩) দিয়া খানকয়েক কুড়া ঘরের খোলা দুয়ার, চাষার মনের মমতা-মাখা চইখের(৪) মতন মাঠের দিগে একদিষ্টে তাকায়্যা রৈচে।—আর, গেরাম-লক্ষ্মীর সবুজ গাছের সোয়াগ-আচল ছিয়্যা দিয়া গায়ের বুকের উপর চাষাগোরে কলিজার রক্তে লাল হৈয়া-ওঠা মহাজনের দোতালা দালানটারে ঠিক একটা দেমাকি দৈত্যের মতন দেখা যাত্যাচে। তার খোলা দরজার মস্ত হা'র মধ্যে সে য্যান সারাটা মাঠের বেবাক ফসল ভর্‌ব্যার চায়!

মাঠের ফস্‌লি খ্যাতগুলারে দো-আধ্‌লা(৫) কৈরা দিয়া নিলখের(৬) দিগে চৈলা-যাওয়া হালটের ধলিখান ঘুমের আলসের মতন নিভাজ হৈয়া পর্‌য়া রৈচে। তারি এক কিনারে পারা-গাড়া ডিঙ্গি নাও-খানের ধারে বুক-সমান জলে খারায়্যা ফজু সেক জলে তল্‌তল্‌-হওয়া আউস ধান কাটব্যার লাইগ্‌চে। তামান দিন না-নাওয়া-খাওয়ার আগুনের জ্বালা তার দেহের মধ্যে ধপ্‌ধপায়্যা জ্বৈলা উঠ্যা আপ্‌নেই নিব্যা গেচে,—কেবল মাথার আতেল্যা(৭) ভুল্‌কা(৮) চুল আর গাথায়(৯) পড়া-চইখে তার না-নাওয়া-খাওয়ার সকল তাপ মাখা। তার মন আর দেহে নাই, ধানের ঐ বাইলগুলার মধ্যে আইজ তার বাসা,

(১) বাঁকা। (২) সারি (Line)। (৩) ফাঁক। (৪) চক্ষু। (৫) দ্বিধা-বিভক্ত। (৬) দিক চক্রবাল। (৭) তৈলহীন। (৮) ঝাঁকড়া। (৯) কোটরগত।

তার চইখের সবখানি নজর খালি ঐ খ্যাতের ব্যার টুকের মধ্যেই লাইগা রৈচে। গায়ের বেবাক জোর সে আইজ তার হাত দুইটির রগে রগে চালায়্যা দিচে। নাকের নিয়াস(১) বিরাম মাইনা চলে, তার হাতে কামের আইজ আর থামন নাই। হায়রে—তার যদি আর দুইটা হাত থাইক্‌ত!

দুই রোজ এক্‌জায় ডাওয়রের(২) পর আইজকার বিষ্টি-থামা বিকালে বাবুগোরে ছোট্ট পান্‌সীখান মাঠে বাইর'চে। এতক্ষণ চকের(৩) দক্ষিণে বিলের আন্দাজলে(৪) বাইচ্-খেলা হালটের ধলি দিয়া বাড়ী ফিরনের মুখে নাওখান ফজুর খ্যাতের কিনারে আইসা পৈল। মাঝি-গোরে খালি হাতে বসায়্যা থুয়্যা মাইজা বাবুর ছাওয়াল পাছা-নায় হাইল ধৈর্‌চেন, আর বড় তরপের চশমা-আলা বাবুর লগে সেনেগো বাড়ীর আর মিত্তির বাড়ীর দুই ছাওয়াল আগা-নায়(৫) বৈঠা হাতে বসা।

মাজাজলে(৬) খারায়্যা উপুর হৈয়া ধান কাটনে-লাগা ফজু সেকেরে দেইখা মাইজা বাবুর ছাওয়াল তার নাম ধৈরা ডাইক্‌লেন। আইজ পাচ দিনও পারয় নাই ফজুর ম্যায়া(৭) তিনির কাছে থিকা বাপের লাইগা জ্বর ছাড়নের ওষুদ নিয়া গেচে!

ইদিগে—শেষ বেলার রৈদের জিল্‌টুক ঢাইকা কাজ্‌লা(৮) মেঘের মস্ত একটা খাণ্ডারা(৯) তামান্ আকাশ ছায়্যা ফেলাল্য। তার কালা-রং-এর ছাপে সারা পিথিমি মসিমাখা(১০)। খেইতারা(১১) সগলে

(১) নিশ্বাস। (২) শ্রাবণ-বর্ষা, ঘন-বর্ষা। (৩) মাঠ। (৪) স্রোতহীন (stagnant)। (৫) নৌকার সম্মুখ দিক। (৬) কোমর জল। (৭) মেয়ে। (৮) কাঁজল বর্ণ। (৯) খণ্ড। (১০) কালো রং। (১১) কৃষক ভৃত্য, যারা কৃষকদের মাঠে সহায়তা করে।

সার্ সার্(১) কৈরা কাটা-ধান নায় ভরব্যার লাইগ্‌ল, কেউ ধান-বোঝাই নাও তরাতরি বায়্যা বাড়ী ফির্যা চৈল্ল। ফজুর আইজ আর কিছুতেই ভুর্‌খেপ্ নাই। সে ক্যাবল জলের উপর জাগা অন্ধকারে পরায় মিলায়্যা-যাওয়া কালা কালা ধানের বাইলগুলারে হাত্‌রায়্যা হাত্‌রায়্যা কাট্‌ত্যাচে,—এখনো যে তার অদ্ধেক খ্যাত বাকী।

মাইজা বাবুর ছাওয়ালের ডাকে সে তিনির দিগে মুখ ফিরায়্যা তাকাল্য, ঠিক সেই লগে হাতের বৈঠা নামায়্যা রাখনের অব্‌সরে-ভরা ছয় ছয়খান হাতের উপরে তার চইখের বেবাক নজর অনার(২) হৈয়া লুটায়্যা পৈল। বাবুগোরে দেখন মাত্রেই তার হাতে রোজকার মতন সেলামটাও যে আইজ উঠ্‌ল না। মাইজা বাবুর ছাওয়াল যে তারে এম্নিভাবে জলে ভিজনের নিষেধ কৈর্‌লেন, নিয়ম মতন ওষুদ খায়্যা বেরাম ভাল করণের উপদেশ দিলেন, ই-সগলের কিছুই তার কানে ঢুক্‌ল না। জল দেইখা তিষ্ণায়-ফাটা পরাণের মতন তার মন যে রৈচে—ক্যাবল ঐ নায়ের উপকার হাত ছয় খানির দিগে হাপুস্ হৈয়া তাকায়্যা!

ঝর্ ঝর্ কৈর্‌য়া বিষ্টি পরায় নামে নামে, বাবুগোরে বাইচের নাও ফজুর খ্যাত ছারায়্যা খানিক তফাতে গেচে। আকাশ-জোরা নিশুতি(৩) আন্ধার আর বিষ্টির আঝইর(৪) ঝরায় দিগ্‌দিশা বেবাক বুজায়্যা(৫) দিল,—ক্যাবল, ফজুর খ্যাতের কালা কালা ধানের বাইলগুলা আন্ধারের

(১) অতিব্যস্তে। (২) অনড়। (৩) নিস্তব্ধ। (৪) অনবরত। (৫) ঢাকিয়া, আবৃত করিয়া।

সেই কষ্ঠি কাজলের মধ্যে খিকাও তার জলে-ভরা চইখের দিগে একদিষ্টে চায়্যা রৈচে!

* * * * *

খেইতারা সব চৈলা যাওয়নে সারা মাঠ নিটাল(১)—নিভাজ, জন-প্রাণীর কাসির আওয়াজটাও নাই, ক্যাবল দূরে শুনা যায় ছয় খান হাতের বৈঠায় জলের বুক আগ্‌লায়্যা-যাওয়া—ঝুপ্ ঝুপ্—চুপ!

(১) নিস্তব্ধ, জন মানব শূন্য।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মানুষ ও সমাজ।

—:*:—

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান—আর সমাজকে গড়ে' তুলেছে মানুষ। সুতরাং মানুষের জীবন সমাজের দাবী চাইতে চিরকাল মহত্তর বৃহত্তর, ও শক্তিশালী হয়ে থাকবেই। কেননা মানুষ সর্ব্ব কালের কিন্তু সমাজের কোন একটা বিশিষ্ট দাবী কেবল একটা বিশেষ কালের—যা-গড়ে' উঠেছে বিশেষ একটা প্রয়োজনের তাগিদে—কিম্বা বিশিষ্ট একটা মনের ভঙ্গীতে।

কি আগে? মানুষ না সমাজ?—মানুষই আগে—মানুষই সমাজ গড়ে' তুলেছে—মানুষেরই প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ দানা বেঁধে উঠেছে। আজ আমরা সেই মানুষকেই খাটো করে' সমাজের বিধি নিষেধকেই বড় করে' তুলেছি—অর্থাৎ সমাজের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মন নিয়ে যে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের যেমন ভঙ্গিমা গড়ে' তুলে-ছিলেন, সেই ভঙ্গিমাটাকেই আজ আমরা বড় করে' দেখছি—কারণ সেইটেই যে আমরা চর্ম্মচোখে দেখতে পাই—সেই বিশেষ ভঙ্গিমার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মন ছিল তা আমাদের আলোচনার মধ্যেই আসে না—তাই সেই বিশেষ ভঙ্গিমাটা দিয়েই আজ আমাদের প্রয়োজনকে আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে যাচ্ছি। যাত্রা সুরু করবার সময়ে আমরা গরু দিয়েই গাড়ী টানিয়াছি, মাঝ পথে এসে

আজ আমরা গাড়ী দিয়ে গরু টানাবার পরামর্শ সভা বসালেম। এই পরামর্শ সভায় মন্ত্রনাদাতা তাঁরাই যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সারূপ্য লাভ করবার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন, যাঁদের প্রাণ নির্ব্বাণের রাস্তা ধর-ধর। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন হলুদ বরণ প্রৌঢ় বটপাতাটা তার বোঁটা থেকে খসে পড়তে পড়তে, তার পাশেই নতুন বেরিয়ে-আসা সবুজবরণ কিশলয়টাকে চোখ উল্‌টে উপদেশ দিচ্ছে—দেখ্, তোর ঐ সবুজ রঙের কোনই মানে নেই—ঐ আকাশের পানে চাওয়া আর ঐ বাতাসের সুরে গাওয়া সে কেবল চোখের ও গলার ক্লান্তি—আর ঐ সবগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে মনের একটা বিরাট ভ্রান্তি।

কিন্তু প্রাণ যে জান্‌বেই—সে ত "মোহমুদ্গরের" সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শঙ্করভাষ্য পড়ে নি। সে ত যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের পাতা উল্‌টোয় না। কোন দিক থেকে একদিন সে মরা গাঙের-ডাকা বানের মতো হুড়মুড় করে' এসে পড়ে—তার সে উচ্ছল চলচঞ্চল নৃত্যশীল স্রোতের বেগ হাস্‌তে হাস্‌তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সে স্রোতের বেগে তার দু'পারে যেখানে যত আল্‌গা মাটির চাপ সব ঝুপ্ ঝাপ্ করে' জলে পড়ে' কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। মানুষের প্রাণ যেদিন জাগে, সেদিন পুঁথির পৃষ্ঠার সঙ্গে সে প্রাণকে মিলিয়ে নেবার জন্যে সে মোটেই ব্যাকুল হয় না—কারণ সে জানে যে তার নিজের মধ্যেই প্রাণকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার দেবতা জাগ্রত হ'য়ে আছেন—সে সেদিন এক শাস্ত্রের শ্লোককে খণ্ডন করবার জন্যে আর এক শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে না—তার যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই—কারণ তখন যে তার সত্য আছে—তাই সে

আপনার মুখের ভাষায় সোজা কথায়, সহস্র বিপদ যুক্তি থাকলেও তার মাঝে নির্ভয়েই বলে' ওঠে—

"মনের পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তিও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধু মাঝে মুক্তাভরা শুক্তি ও।"

ডেকে যখন বান আসে তখন ত নদীর সেই সংকীর্ণ পুরোনো খাতেই আর চলে না। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তার সে দু'পাশেও পাড়ির পাড় ভেঙ্গে কতদিনকার জানাশুনো নিবিড় ঝাউয়ের তিমির বন উপড়ে ফেলে, কত শতাব্দী পরিমিত মাথায় জটা বটগাছটার গহন ছায়া মুছে নিয়ে, তখন নদীকে একটা বৃহত্তর খাত করে' দিতেই হয়। একটা জাতির অন্তরে যখন তেমনি প্রাণের বান ডেকে আসে তখন ত তার সেই পুরোনো মনের খাতেই আর চলে না—তখন সেই জমাট বাঁধা মনের খাতের আশেপাশের হাজার পরিচিত সামগ্রীর মায়া ছেড়ে, সে মনের খাতকে বড় করতেই হয়—সে মনের খাতকে বড় হতেই হবে—আর তবে হবে জাতির পক্ষে মঙ্গল। কেননা পুরোনো মনের খাতকে বড় করলে তার আশেপাশেরই কিঞ্চিৎ ভাঙাগড়া করতে হবে—কিন্তু সেই মনের খাতকে কিছুমাত্র বড় না করলে প্রাণের বান উপ্‌চে উঠে এমনি একটা লণ্ডভণ্ড করবে যে তাতে সে পুরোণো মনের খাতকে ত চেনাই যাবে না, অথচ তার জায়গায় আর কোন নতুন শৃঙ্খলাকেও আমরা পাব না। প্রাণ যেখানে জেগেছে সেখানে সংকীর্ণতাকে মাথা নত করতেই হবে, সঙ্কোচকে কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতেই হবে। প্রাণের এই সনাতন ধর্ম্মকে মেনে যে সমাজ এই প্রাণকে অভিনন্দিত করে' তাকে প্রশস্ত কর্ম্ম-

পাইয়ে দেবে, সেই সমাজই মঙ্গলকে পাবে—নইলে ঐ প্রাণের স্রোতের ছলছল হাস্য কলকল অট্টহাস্যে পরিণত হ'য়ে মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও, অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকেও, অধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকেও ভাসিয়ে নেবে—তখন আর কালিয়-নাগকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশীল চরণের তলে ফণা-বিস্তার করে' থাকতে দেখব না—দেখব তখন তা রুদ্রের মস্তকে আসন নিয়েছে।

ভগীরথের শঙ্খরবে যেমন ভাগীরথী নেমে এসেছিলেন, তেম্‌নি করে শঙ্খরবে যে বাঙলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণের স্রোত চারিয়ে গেল—এটা ত আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। অসংখ্য শুষ্ক পত্র, শুভ্র পত্র, পীত পত্রের ভিতর থেকে যে "সবুজ পত্র" জেগে উঠল, আকাশের ভরা আলোর দিকে চোখ মেলে দিল, বাতাসের খোলা সুরের পানে কান খুলে দিল—সেই জেগে-ওঠার পিছনে যে কার্য্য কারণ দুই-ই রয়েছে—বাঙালীর কবি যে জমাট-বাঁধা বিজ্ঞতার বয়েসে শরৎ-ঊষার মতো তাজা ঠোঁট নিয়ে "ফাল্গুনী"র বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বসন্ত-ঊষার মতো তরুণ সুরে গাইলেন—

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবে ছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।

এত কবির একলার কথা নয়—এর পিছনে যে সমস্ত দেশের নব-জন্মের বেদনার আনন্দ রয়েছে—লক্ষ তরুণ তরুণীর মূক মুখের নীরব

ভাষা কবি-হৃদয়ের শৃঙ্খল-হীন বিরোধ-হীন সহানুভূতির ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে জমা হয়ে উঠে তাঁর বাঁশীর গানে মূর্ত্ত হল—তাই না ও-গানকে আজ আমরা সত্য করে' পাচ্ছি, অমৃত বলে মান্‌ছি। ঐ নবীন কিশলয়গুলোকে যে আজ বাড়তেই হবে। জমাট-বাঁধা পাকা পাতার রাশের ভিতরে যেখান দিয়ে একটুকু আলোর রেখা আসছে, একটুকু বাতাসের আভাস ভাস্‌ছে সেই দিক দিয়ে যে তাদের কচি কচি মাথা ঠেলে তুলতেই হবে। কিন্তু মানুষ ত উদ্ভিদ নয়। গাছের পাতাকে যেখানে একটুকু আলো একটুকু বাতাসের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে—মানুষ সেখানে সেই আলো বাতাসের জন্যে আকুল হয়ে উঠলে তখনই তার চারিদিকের দেয়ালের গা ভেঙ্গে মস্ত মস্ত জানালা বসিয়ে দেবে। এই জানালা বসাবার কথা মুখে আনতেই ত বিজ্ঞ মহলে মহা মাথা নাড়ানাড়ি পড়ে গেল। তাঁরা অবস্থা সঙ্কীর্ণ বুঝে দু' আঙুলের বদলে চার আঙুলের ফাঁকে প্রকাণ্ড এক টিপ নস্যি নিয়ে বলতে সুরু করলেন—না, না, জানালা?—তা হতেই পারে না—এমনি নিরেট দেয়ালের মাঝে আমরা পাঁচ শ' সাত শ' হাজার বছর কাটিয়েছি, আর আজ কিনা সেখানে ম্লেচ্ছের অনুকরণে একটা বিশ্রী হাঁ-করা জানালা বসিয়ে দেবে—এ হতেই পারে না। আর ঐ জানালা দিয়ে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই কখন কি যে ঢুকবে তার ঠিক কি? আলো বাতাসের জন্যে ব্যাকুল যাঁরা তাঁরা বিজ্ঞ মহলের ও-কথা মোটেই কানে তুলছেন না—ও-কথা মান্‌বার তাঁদের উপায়ই নেই। তখন বিজ্ঞ-মহল সেই দেয়ালের ধারে ধারে হাজার হাজার শাস্ত্র-পুলিশকে মোতায়েন করে' দিলেন—বুক ফুলিয়ে বললেন এখন এসো দেখ দিখি কে এই সনাতন দেয়াল ভাঙ্গে। সেই

শাস্ত্র-পুলিশরা দাঁড়িয়েই রইল—ভারী ভারী মোটা মোটা জাঁদরেলি চেহারা—তাদের কাঁধে অনুস্বারের সঙ্গীন—পিঠে ঝুলোনো ব্যাগে বিসর্গের "গ্রেনাদ্"—দু'-গালে লক্ষ্য বছরের বর্দ্ধিত মিশমিশে কালো গালপাট্টা—গালপাট্টা দাড়ি গোঁফে তাদের চেহারা যে কেমন তা দেখাই যায় না—তারা দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করছে না অভয় দিচ্ছে তা বোঝবারই উপায় নেই—সে চেহারা দেখে বিজ্ঞ-মহলের সাহস বেড়ে গেল—বড় আর এক টিপ নস্যি নিয়ে নাথাটা তেজালো করে' জোরালো গলায় হাঁক্‌লেন—এইবার এসো দেখি কে এ দেয়াল ভাঙ্গবে—এ আমার বাড়ী আমার ঘর—আমি এ কাউকে ভাঙ্গতে দেব না। সবুজ পাতারা বসন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে অতি অপ্রতিভ ভাবে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—মহাশয়রা গোড়াতেই একটা বড় ভুল করে' বসবেন না—এ আমাদেরও বাড়ী বটে।

যুদ্ধ বাধল—অর্থাৎ বাকের। চক্রব্যূহ রচিত হল—অর্থাৎ তর্কের। প্রবীন দল নবীন দলকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—তোমাদের প্রাণের স্রোত না অশ্বডিম্ব—আসল কথাটা হচ্ছে ছেলেমানুষী, উত্তরে নবীন দল প্রবীন দলকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—আপনাদের বিজ্ঞতা না হাতি—আসল রোগটা হচ্ছে আরামী মেজাজ। প্রবীণরা গেলেন চটে। তাঁদের মুখ দিয়ে তখন গাদা গাদা অনুস্বার বিসর্গ ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল। নবীন তা মহা কৌতূহলী হয়ে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে লাগল। মনে মনে প্রবীণদের উদ্দেশ্য করে' বল্‌লে—আপনারা অনুস্বার-বিসর্গেরই চর্চ্চা করুন, আমরা এদিকে জানালা বসাই।

কিন্তু নবীনরা যে শুধু গায়ের জোরেই জানালা বসাবে, এই এত

বড় অভদ্র কথাটা ত আজ কিছুতেই চোখ খুলে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—বাড়ীর রঙ্ ঢঙ্ কার ব্যবস্থানুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে? ঐ আরামী মেজাজের মতলবে? না—ছেলে-মানুষের খোস খেয়ালে? এর বিচার কেবলমাত্র একই উপায়ে হতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ দু'দলকেই আলোচনার বাইরে রেখে ঐ বাড়ীর চিরন্তন মঙ্গলের পথ কি, নির্দ্ধারণ করা—ঐ বাড়ীর এক যুগের লোকের আরামের ব্যবস্থা নয়—কিম্বা এক দল লোকের খেয়ালের সার্থকতা নয়—সেটা হচ্ছে সকল যুগের লোকের কল্যাণের পথ। সুতরাং আমাদের সত্য দেখতে হবে কেননা একমাত্র সত্যেই কল্যান রয়েছে। দেখতে হবে আমাদের মানুষের সত্য, সমাজের সত্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যেকার যে যোগ সেই যোগের সত্য-সম্বন্ধ।

(২)

মানুষের অন্তরে সবার চাইতে আদিম সম্পদ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। একদিন মানুষ ছিল বাতাসের মতোই স্বাধীন—কিন্তু না—বাতাসের চাইতেও বেশি। কেননা বাতাসের মন বলে' কোন জিনিস নেই—কিন্তু মানুষের ছিল। বাতাসের চলা-ফেরা নির্ভর করে অনৈসর্গিক কারণের ওপরে—কিন্তু মানুষের চলাফেরা নির্ভর করে তার নিজের উপরেই—তার ইচ্ছা, তার will-এর উপরে। সেই আদিম-কালে মানুষের যে কেমন জীবন ছিল তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্‌ল, ততই দেখা গেল যে মানুষের অন্তরে এই স্বাধীনতার পাশে পাশে আর একটা নতুন জিনিস গড়ে'

উঠছে—সেটা হচ্ছে অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। নিতান্ত একা থাকাটা তার কাছে ধীরে ধীরে রসহীন হ'য়ে উঠল। এমন কি তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতাও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারলে না। নিজেকে সে অন্যের ভিতরে দেখতে চায়—নিজের মনের ভাব সে অন্যকে জানাতে চায়। তার সুখে দুঃখে আমোদে আহ্লাদে একজন অংশীদার না হ'লে আর তার চলে না। যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হ'ল সেই দিন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেদিন নিশ্চয় দেবলোকে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল—স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। কেননা সেই যে কোন্ আদিম কালে কোন্ গহন ঘন অরণ্যের অন্তরালে দুটি মানুষের মিলন, সে হচ্ছে মানব-সভ্যতা-সৌধের প্রথম প্রস্তর-স্থাপনা। ঐ দুটি মানুষের একদিন মিলন হয়েছিল বলে' জঙ্গল কেটে পল্লী বসল, পল্লী ক্রমে নগর হল, নগর নগরী ক্রমে রাজ্য হল, রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হ'য়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচিত্রতম বিলাসের পথ করে' দিলে—বিচিত্রতম বিকাশে সার্থক করে তুল্‌লে।

কিন্তু ঐ যে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী দুটি মানুষ—যে মুহূর্ত্ত থেকে সেই দুটি মানুষ একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করল—সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাদের সেই অসীম স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হল। কেননা তখন তাদের ঐ একত্র বসবাস চিরকাল সম্ভব করে' তুলতে চাইলে তাদের দুজনকেই পরস্পরের মন রেখে চলতে হবে—পরস্পরের সুখ সুবিধা দেখতে হবে—পরস্পরের রুচি বিশ্বাস ভাব সমস্তকে সম্মান করে' চলতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তাদের পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে' চলতে হয়, তবে তাদের একত্র

বসবাস যে রাত্তিরও পোয়াবে না এটা নিশ্চয় করে' ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আঘাতের উপরে কিছুই গড়ে ওঠে না, তার নীচে যা কিছু সবই ভেঙ্গে যায়। সুতরাং ঐ দুটি মানুষ যদি বাস্তবিকই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গলাভের একান্ত অভিলাষী হন তবে তাদের মনের ভাব প্রাণের বেগ ইত্যাদিকে একটা সংযমের মধ্যে আবদ্ধ করতেই হয়—এক কথায় তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হয়। অপরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা সার্থক করতে চাইলে মানুষকে ঐ মূল্যই দিতে হয়। এই হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধে ভিতরের আসল কথাটা।

সুতরাং আমরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনটাকে একটা সংযমের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই—আমাদের মনকে প্রাণকে বাক্‌কে কার্য্যকে একটা সংযমের বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করি, সে-সবের আদিম সত্যটা—অর্থাৎ যে-সত্য থেকে তা উদ্ভূত হয়েছিল - সেটা নৈতিক শিক্ষাও নয় বা আধ্যাত্মিক দীক্ষাও নয়—সেটা হচ্ছে কেবল মানুষের একটা ইচ্ছার সার্থকতা সাধন করবার জন্যে, আর একটি ইচ্ছার সঙ্কোচ। রামের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব করবার নিতান্তই গরজ হয়ে থাকে তবে অবশ্য রামের পাকা-ধানে মই দেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়—এটা বোঝবার জন্যে পদ্মাসন করে' ধ্যানে বসে যেতে হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের মিলন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ কত লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গিয়েছে—আজ মানুষের সমাজ দুটি মানুষের নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের। এতদিন বেঁচে এসে আজ আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অনেক পরিমাণেই জানি—তার মনের ভাব, প্রাণের ভঙ্গী, বুদ্ধির গতি ইত্যাদি অনেক রহস্যই

আজ আমাদের চোখের সামনে খুলে গেছে। আজ আমরা জানি তার দুঃখ কিসে, সুখ কোথায়। এই মানুষকে আজ আমরা জানি বলে' আজ আমার প্রতিবেশী কিসে আমার প্রতি বিরূপ না হয় তার জন্যে প্রতি পদে পদে আমাকে আর চিন্তা করে' করে' পা ফেলতে হয় না—তার সম্বন্ধে আমার একটা ব্যবহার জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্তু আমাদেরই এই জমাট-বাঁধা ব্যবহারের পিছনকার আসল সত্যটা সবাই ভুলে গিয়েছি—আজ আমরা ঐ ব্যবহারের পিছনকার একটা মানসী মূর্ত্তিকে সত্য-দেবতা রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি—এই দেবতারই নাম হচ্ছে নীতি। কিন্তু ঐ যে বলেছি আমাদের জমাট-বাঁধা ব্যবহার, এ আমাদের এমনি অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—এমনি second nature হ'য়ে উঠেছে যে, ঐ ব্যবহারের অন্তরালে যে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কোচ রয়েছে তা আমরা কেউ মনেও করতে পারি নে—কেননা সেই আদিম মানুষের মতো সেই উদ্দাম স্বাধীনতা আজ আমরা কেউ অনুভব করতে পারি নে—অশিষ্ট মনের চাঞ্চল্যও আজ আর আমাদের জীবনে নেই। এ-সব অত্যন্তই ভাল কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু—

এই "কিন্তু"টাকে নিয়ে যত মুস্কিল। কেননা সমাজের উপরে যেমন ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার আছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের উপরেও সমাজের অত্যাচার বলে' একটি পদার্থ আছে। আর এ দুই অত্যাচারের দ্বিতীয় আত্যাচারটিই ভীষণ। কেননা একটা মানুষ যখন সমাজের উপরে অত্যাচার করে' তখন তাকে শাস্তি দেবার জন্যে ত লক্ষ লোকের মন বুদ্ধি হাত পা রয়েছেই—যার শক্তি অব্যর্থ। কিন্তু যখন লক্ষ লোকে মিলে একটা ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করে'

তখন আর তার কোন আপিল নেই। এই ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির অত্যাচারের সম্ভাবনা ও সুবিধা বর্ত্তমান হিন্দুর সমাজে অনেক। হিন্দুর সমাজে মানুষের মনে নীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিও এসে যোগ দিয়েছে—এই রীতিনীতিই বর্ত্তমানে ধর্ম্ম নাম নিয়ে হিন্দু সমাজে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে—এই ধর্ম্ম যেমন তেমন ধর্ম্ম নয় একেবারে সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মের দু'পাশে দুই অসুর দাঁড়িয়ে মোটা মোটা দু'জোড়া গোঁফ পাকিয়ে চোখ লাল করে মানুষের আত্মা নামক জিনিসটিকে একেবারে চেপ্টা করে' ছেড়ে দিচ্ছে—এই দু'-অসুর হচ্ছে সমাজ-চ্যুতি ও স্বর্গচ্যুতির ভয়।

(৩)

এখন পূর্ব্বে যা বলে' আসা গেল সেই কথাগুলো যদি স্বীকার করি তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও মানতে হয় যে, আমাদের যে প্রতিদিনকার আচার ব্যবহার—তা সে আচার ব্যবহার আমাদের মনে অধিষ্ঠিত নীতি-গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়েই সোজা চলুক, বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-দেবতার মুরুব্বিয়ানার আদরেই "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে' মাটি গেড়ে বসুক—সে রীতিনীতির একটা মুসাবিদা মনুই লিখুন বা রঘুনন্দনই করুন—সে সবের একটা কোন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্য বা অর্থ নেই—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে spiritual significance ও intrinsive value, তা নেই। আর এ কথাটা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, সকল জিনিসেরই আধ্যাত্মিতার দিকটাই হচ্ছে মানুষের দিক থেকে সবার চাইতে বড় দিক।

উপরের ঐ কথা শুনে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই বলে' উঠবেন, ওটা হচ্ছে একটা অতি সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত—ও সিদ্ধান্ত সত্যিও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যা যদি হয় তবে ত ও-কথা বলাই পাপ, আর যদি সত্যি হয় তবে অমন সব সাংঘাতিক সত্য দশজনের সমুখে প্রকাশ করার মতো অবিবেচনার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা আমরা যদি রীতির পিছন থেকে নীতি ও নীতির পিছন থেকে নরক-ভয়কে খারিজ করে' দেই, তবে সমাজের রামশ্যামহরি অমনি সবাই উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে—কাউকেই আর ঠেকান যাবে না। কিন্তু আসলে কোন ভয় পাবার দরকার নেই। কেন?—তা বলছি।

প্রথমত, এ-কথা সত্য নয় যে রামশ্যামহরি আজ সবাই উশৃঙ্খল হবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে—এবং তারা তাদের সে রোখকে সংযম করে' রেখেছে কেবল পরলোকের ভয়ে। সামাজে উশৃঙ্খল হবার অর্থ—অন্তত যে উশৃঙ্খলতায় সমাজের আর দশজনের প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু আসে যায়—সেটা হচ্ছে সমাজের অপর সভ্যদের আঘাত করা—দেহে বা মনে। কিন্তু অপর মানুষকে আঘাত করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। যদি বল যে সমাজে কেউ কাউকে কি আঘাত করে না?—অবশ্য করে। কিন্তু সেইটেই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সমাজের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে যারা আঘাত করে তাদের সংখ্যা যারা আঘাত করে না তাদের চাইতে অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সাধারণত শান্তিপ্রিয়—অ-সাধারণত সংগ্রামপ্রিয়। যে উশৃঙ্খল সে সমাজে অশান্তি আনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও অশান্তি ঘটায়—সুতরাং আপন গরজেই তাকে সংযমী হতে হয়।

তৃতীয়ত, মানুষের অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা, এমনি একটা সত্য ইচ্ছা যে, কেবল ওর তাগিদেই তাকে অন্য দশজনের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে। মানুষের পক্ষে অপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি ইত্যাদি আকর্ষণ করবার ইচ্ছাও একটা অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—এই ইচ্ছাই মানুষকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রীতিমান হ'তে শেখায়, কেননা এক প্রীতিই প্রীতিদান করতে পারে। অবশ্য এমন লোকও দেখা গেছে যারা প্রীতিরও ধার ধারে না বা শান্তি-শোয়াস্তিরও তোয়াক্কা রাখে না—কিন্তু দেখা গেছে এমন লোকদের রীতির পিছনে নীতি ও নীতির পিছনে আধ্যাত্মিকতার লম্বা বক্তৃতা জুড়ে দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। সুতরাং নতুন কোন একটা সামাজিক প্রলয়ের কারণ সৃষ্টি করা হবে না, যদি একথা বলা যায় যে আমাদের আচার ব্যবহারের পিছনকার অর্থটা আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হচ্ছে নিছক সামাজিক—অর্থাৎ ওর Significance spiritual নয়—Sociological.

আসলে মানুষ দেবতা না হলেও দানব নয়—মানুষের মধ্যে ভাল হবার ইচ্ছা নিজ গুণেই বর্ত্তমান। নিট্‌শ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি চিরকাল বর্ত্তমান হ'য়ে রয়েছে এবং আশা করা যায় চিরকাল থাকবেও। মানুষের মধ্যে যদি এই নিজে ভাল হবার ইচ্ছা, পরের ভাল করবার ইচ্ছা না থাকত তবে এতদিনে মানুষের হাতে পায়ে বড় বড় ধারাল নখ দেখতে পাওয়া যেত। মানুষ এঞ্জিন নয় যে তাকে "রিলিজনের হাপরে পুড়িয়ে নীতির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে গড়ে তোলা যাবে। মানুষের অন্তরে এমন একজন কেউ আছেন যিনি আপন আনন্দেই মানুষকে

চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। মানুষকে অতিরিক্ত objective করে' দেখাই ভুল দেখা। মানুষের আসল সত্যই হচ্ছে যে, সে Subjective—কারণ সে চৈতন্যময় পুরুষ। মানুষের অন্তরের ঐ পুরুষকে অন্ধ করে' যখন আমরা বাইরের নিয়ম কানুনকেই চক্ষুষ্মান করে' তুলি, তখন আমাদের ব্যবহারটাও সঙ্গে সঙ্গে হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর মতো হ'য়ে পড়ে। রাজা হবচন্দ্র একদিন ফাল্গুনের শেষে প্রচণ্ড বিরক্ত ও বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন। মন্ত্রী গবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দশহাজার লোক লাগিয়ে দিলেন রাজবাগানের হাজার আম গাছে উঠে তাদের ডালপালা ভীষণ ভাবে ঝাঁকাঝাঁকি করতে। বলা বাহুল্য উক্ত উপায়ে কোন বাতাস সৃষ্ট হয়ে গ্রীষ্মকে শীতল করে' নি—লাভের মধ্যে সেবার রাজার আমবাগানে একটি আমগাছেও আম ফল্‌ল না।

কেউ কেউ এইখানে বলে' উঠতে পারেন যে মন্ত্রী গবচন্দ্র যাই করুন না কেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেমন সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করে' তাকে "ইলেকট্রন"-এ পরিণত করেন, তেমনি নীতি জিনিসটাকে অমন করে' বিশ্লেষণ করে' আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজনটা কি? রীতির পিছনে নীতি, নীতির পিছনে স্বর্গলাভের লোভ থাক্‌লই বা—ওই ভয়ে আর ওই লোভেই যদি সমাজে দু' একজনাও শিষ্ট হ'য়ে ওঠে তবে ক্ষতিই বা কি আর মন্দই বা কি? অবশ্য কথাটা অত্যন্ত সমীচীন।

কিন্তু আমাদের সমাজমনকে চারিদিক থেকে যে বহুদিন হ'ল নানা ব্যাধি আক্রমণ করেছে এটা আজ আমরা আমাদের শরীর একটুকু নাড়াচাড়া করতেই টের পেয়েছি। আজ আমরা বিশ্ব মহারাজের

রাজপথে একটুকু সজোরে পদক্ষেপ করে' দু' এক পা যেতেই আমাদের মনের নানা দিক থেকে মুমূর্ষুর যন্ত্রনার "উহু উহু" শব্দ শুনতে পেয়েছি। ঐ "উহু উহু"-তে আমরা আজ সন্তুষ্ট। কারণ ওটা হচ্ছে এরি প্রমাণ যে আমাদের মন একেবারে অসাড় হয় নি—অর্থাৎ মরে নি—তবে ব্যাধি-আক্রান্ত। কিন্তু রোগমুক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের একটা স্বভাবিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজ মনকে আমরা সকল প্রকার ব্যাধি হ'তে মুক্ত করতে চাই-ই। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কথাটা আজ সবাই জানেন যে রোগীকে ভাল করতে হ'লে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার তার সর্ব্ব-প্রকার ভয় ভাঙ্গান। আমাদের সমাজ-মন থেকে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার সকল প্রকারের ভয় তাড়ান। নীতির পিছনের যে সত্যটা সেটা যে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহলোক বা পরলোকের ভীতির উপরে নয়—একথাটা তাই আজ আমাদের পরিষ্কার করে দেখতেই হবে। যে ছেলেটা অতিরিক্ত রকমের দুর্দ্দান্ত সে-ছেলেটার পক্ষে দু' একটু জুজু-বুড়ির ভয় থাকাটা হয়ত মন্দ নয়—কিন্তু যে পিলেপেটা রোগা ছেলেটি বাতাস একটু জোরে বইলেই ভয়ে কেঁকিয়ে ওঠে তার মনের পিঠে আরও দু'-একটা ভূতের ভয়ের পুলটিস্ লাগিয়ে দিলে সে যে অতি শীঘ্রই পঞ্চভূতের সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে তার কোন সন্দেহ নেই। সকল রোগীরই যে এক পথ্য নয় এটা কি আয়ুর্ব্বেদ কি হোমিওপ্যাথি কি এলোপ্যাথি সকল শাস্ত্রেই বলে। আর আমাদের সমাজের, দুর্দ্দান্ত ছেলেটার চাইতে পিলে-পেটা ছেলেটার সঙ্গেই যে বেশি সাদৃশ্য আছে তা নেহাৎ অপ্রত্যক্ষ নয়।

এখন উপরে যে সব কথা বলা গেল সেই সব কথার সিদ্ধান্ত

স্বরূপে এই কথাটা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে মনে করি যে, যিনি সমুদ্রযাত্রা করেন আর যিনি করেন না, তাঁদের দু'জনের মধ্যে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কোনই তারতম্য নেই। যে-কোন সমাজের যে-কোন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সুতরাং হিন্দুর সামাজিক আইন কানুনের, মানুষকে বিশেষ করে' ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে দেবার, কোন ভগবানদত্ত ক্ষমতা নেই।

সুতরাং এই কথাটা আজ আমরা নির্ভয়েই মনে করব যে আমাদের বাপ দাদারা টিকটিকিটাকে যতখানি সম্মান করে' চলতেন, আমরা যদি ততখানি সম্মান করে' না চলি, তবে আমাদের আত্মার অধোগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যে টিকটিকিটাকে সম্মান না-করবার স্বাধীনতা এই-ই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা;—প্রাচীনের কবল থেকে, গতানুগতিকের শৃঙ্খল থেকে, অর্থাৎ অপর মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তা হোক্ সে "অপর মানুষ" নিজেরই বাপ-দাদা। এই স্বাধীনতা যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে মানুষের প্রাণের গতি মরে' এসেছে, মন জমাট বেঁধে উঠেছে, বুদ্ধি অল্প হ'য়ে গিয়েছে—মানুষ ধীরে ধীরে সেখানে হয়ে ওঠে মেষ। ঐ অবস্থায় তারপর একদিন যখন এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের ডাক পড়ে তখন অন্তরের চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে দেখি সেখানে কোন খানেই এক ছটাক মনুষ্যত্বও আর অবশিষ্ট নেই।

এই মনুষ্যত্বের ডাক পড়েও—কেন পড়ে? তা বুঝলেই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসবে।

(৪)

যে-মানুষ বলে জগতে যা-কিছু জানবার আছে তা তার জানা হ'য়ে গেছে—এবং সে যা জানে তাই হচ্ছে সকল জানার সেরা জানা—এ-জগতের একেবারে শেষ খবরটা পিতামহ ব্রহ্মা তার কাছে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে তারহীন টেলিগ্রাফের কোডের সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তার আর কিছু জানবারও নেই বোঝবারও নেই, শোনবারও নেই শোনাবারও নেই—সেই মানুষটাকে আজ আমরা এই হাজার প্রশ্ন হাজার সমস্যার মাঝে অবশ্য কৃপার চক্ষেই দেখি এবং তার তুল্য হাস্যাস্পদ জীব আর আমরা খুঁজে পাই নে। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যা হাস্যাস্পদ মাত্র একটা সমাজের পক্ষে ঠিক সেইটেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

মানুষের উপরোক্ত মনোভাব, দুটি কারণে ঘটতে পারে। একটি হচ্ছে তার মস্তিষ্ক নামক স্থানটিতে বুদ্ধি নামক পদার্থটির কিঞ্চিৎ অভাব—দ্বিতীয়টি তার হৃদয় নামক জায়গাটিতে আত্মম্ভরিতা নামক জিনিসটির প্রচুর সদ্ভাব। ঐ দুয়ের পরিণাম ফলই হচ্ছে মানুষের পতন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে ফল একই।

সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের প্রথম মিলন হয়েছিল—সেদিন থেকে লক্ষ বৎসর কেটে গেছে—আজ মানুষের সমাজ যে কেবলই লক্ষ লক্ষ মানুষের, শুধু তাই নয়—আবার লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমাজও বটে—যা গড়ে' উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভেদে জাতিভেদে বা দেশভেদে। এই সব বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও আদান প্রদান চলেছে। মানুষের ও মানুষের মধ্যে যে আদান প্রদানের ইচ্ছার সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে

মিলন হয়—ব্যষ্টির বৃহত্তর রূপ সমষ্টিগত সমাজেও সেই সত্যই ফুটে উঠছে। ব্যষ্টিতে যা আছে সমষ্টিতেও সেই ধর্ম্মই ফুটে ওঠে। ব্যষ্টিগত ভাবে সবাই সামাজিক জীব—আর সমষ্টিগত অবস্থানে সবাই মৌনী-বাবা হন না। আবার অপর পক্ষে ব্যষ্টিতে যা মোটেই নেই সমষ্টিতে হলেই তা গজিয়ে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই উড়ে-মালি—আর তারা সমষ্টিগত হলেই নেপোলিয়ান বা চেঙ্গিস্‌খাঁর মত পৃথিবী জয় করে' নিয়ে এলো—এমনটা হয় না।

সে যা হোক্, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে এই যে আদান প্রদান তা হতে পারে—এবং চিরকাল যা হ'য়ে আসছে—দুটি রকমে। হয় প্রীতির ভিতর দিয়ে মিলনে, নয় দ্বন্দের ভিতর দিয়ে সংঘর্ষে। এই দ্বন্দের পিছনে আছে সমাজবিশেষের স্বার্থ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বেষ। এই সংঘর্ষ যে কেন হয়, মানুষের স্বার্থ যে কত রকমের সে আর এক লম্বা ইতিহাস। বলা বাহুল্য তার জায়গা এখানে নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংঘর্ষ হয়ই—এটা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই দু'-রকমের আদান প্রদানে মানুষের দু'-রকম মনের ভাব হতে বাধ্য। যখন কেউ প্রীতি সঙ্গে নিয়ে মিলন প্রত্যাশী হ'য়ে আমাদের দ্বারে আসে তখন আর তাকে আমরা ফেরাতে পারি নে—মানুষের সে স্বভাব নয়। কিন্তু যখন কেউ স্বার্থ বা দ্বেষ সঙ্গে নিয়ে আমাদের আঘাত করতে আসে, তখন আমরা সে আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণ কবুল করি—মানুষের এও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই দ্বেষের সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে আমাদের বাধ্য হ'য়ে দেশের কথা কইতে হয়।

একটা দেশে জাতি বা সমাজের প্রতি আর একটি দেশ জাতি বা সমাজের যে আঘাত—এ আঘাতের দুটো দিক আছে—একটা অন্নের দিক আর একটা আত্মার দিক—হয় দেহ দিয়ে দেহকে আঘাত, নয় মন দিয়ে মনকে আঘাত। আমরা হিন্দুরা দেহের চাইতে আত্মাকে বড় বলে' মানি—সুতরাং সমাজে সমাজে এই দ্বন্দে মনের পরাজয়ই বড় পরাজয়।

এই পরাজয় থেকে বাঁচবারও আবার দুটী উপায়। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দশদিকের দিকপাল-গণকে সাক্ষী রেখে আততায়ীর কাছে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়া যে, আমার দেহ তার দেহের চাইতে দৃঢ়; আমার মন তার মনের চাইতে বলিষ্ঠ—দেহের ধ্বংস ঘট্‌তে পারে কিন্তু আমার আত্মার স্বাতন্ত্র্য তার আত্মার নিকট মাথা নত করবে না—করবে না। আর ঐ করতে গেলেই তখন ডাক পড়ে মানুষের মনুষ্যত্বের। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এই মনুষ্যত্বই বজায় থাকে না, যদি না মানুষের মনের দিকটা মুক্ত থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে সমাজের চারিদিকে প্রকাণ্ড "অচলায়-তনের" দেয়াল তুলে দিয়ে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীর মতো বাস করা। হিন্দু এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল।

কিন্তু ঐ দ্বিতীয় উপায়টি একটা উপায় হলেও, ওই উপায়ের ভিতরে একটা মস্ত বিপদ আছে—যদি না সব সময়ে সজাগ থাকা যায় তবে সেই বিপদ মানুষকে জড়িয়ে ধরেই। কারণ "অচলায়-তনের" ঐ দুর্গের মাঝে মানুষকে বাস করতে হয় সমস্ত বিশ্বকে বাইরে রেখে—তাকে চলতে হয় সমস্ত বিশ্বমানবের সংস্পর্শ থেকে

আপনাকে বাঁচিয়ে। তার সাম্‌নে আর তখন কোন নতুন সমস্যা নেই, নতুন চিন্তা নেই, নতুন প্রশ্ন নেই—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই "থোর বড়ি খাড়া" আর "খাড়া বড়ি থোর"—ঐ অবস্থায় সব কিছুই পুরাতন হয়ে আসে—সেই পুরাতনে সব একঘেয়ে হয়ে ওঠে—তখন আর মানুষের নতুন উৎসাহ নতুন উদ্যম থাকে না—ঐ অবস্থায় মানুষের প্রাণ নিস্তেজ হয়ে আসে, বুদ্ধি জমাট-বাঁধা পাথরের মতো হয়ে যায়—চারিদিকে তার আরামের আবেশ ঘিরে আসে—তখন সে চৈতন্যময় শক্তিময় আনন্দময় পুরুষ নয়—সে হচ্ছে তখন অভ্যাসের চাবি দিয়ে দম-দেওয়া কলের এঞ্জিন—মানুষের ঐ খানে জীবন্ত সমাধি—ঐ খানে মানুষের আত্মা আপনাকে প্রকাশ করবার কোন পথই পায় না।

এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে চাই বিশ্বের সঙ্গে সমাজের সংযোগ—সমাজের মাঝ দিয়ে বিশ্বের আলোকের মুক্ত ধারা বিশ্বের বাতাসের মুক্ত প্রবাহ—যে আলোক যে বাতাস সমাজমনকে নিত্য নব নব স্বপ্ন দিয়ে নিত্য নব নব কর্ম্মে নিয়োগ করে, নব নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে' রখবে; সুতরাং চাই চারিদিকে মুক্ত বায়, মুক্ত আলোক, কাজেই চাই সনাতন দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওম্‌নি সনাতন জানালা।

আর যদি জানালা না বসাই তবে মানুষ ঐ নিরেট দেয়ালের মাঝে একদিন চোখ কচ্‌লিয়ে জেগে উঠবে, জেগে উঠে শিউরে উঠ্‌বে, বল্‌বে—এ কি করেছি—এ কি করছি—কোন্ মৃত্যু থেকে বাঁচতে গিয়ে আবার কোন্ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। সেদিন জাগবে মানুষের আত্মার বিদ্রোহ। না না, চাই নে এই মৃত্যু—পলে পলে

তিলে তিলে এই মৃত্যু। সেদিন মানুষকে হাজার দেয়ালও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না—সেদিন সমাজের পাথর-বাঁধা শক্ত উঠানের বুক চিরেই "সবুজপত্র" গজিয়ে উঠবে—"ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠবে—"পঞ্চকের" গলা কেঁপে উঠবে। সেদিন মানুষ দুর্ব্বার ভরসা নিয়ে বলে উঠবে—আমার যদি বাস্তবিকই কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে বিশ্বের হাজার বিরোধের মধ্যে তা আপনাকে স্পষ্টই করে' তুল্‌বে উজ্জ্বলই করে' তুল্‌বে—আমি ভয় কর্‌ব না—ভয় করে' আমার সেই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার কর্‌ব না—আমি ভয় কর্‌ব না—কারণ আমি জানি যে আমার মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি মাটি নন পাথর নন—তিনি শাশ্বত তিনি অমৃত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাইবোন।

——:*:——

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর-বেলা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছিলাম। কানের কাছে চেচামেচিতে ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল—বুঝলাম পাড়ার ছেলেরা জাম কুড়ুতে এসেচে। গাছে উঠতে পারে না অথচ জাম খাবার লোভ আছে, ছোট ছোট এমন পাঁচ সাত দশ জন ছেলে মেয়ে মিলে একটু বড় একজন কাকেও মুরুব্বি ধ'রে সময় নেই অসময় নেই এই জামতলায় জমায়েৎ হয়। গাছে উঠে মুরুব্বি বাছা বাছা জাম দিয়ে নিজের থলি ভর্ত্তি করে এবং কখনো বা দয়া কখনো বা রাগ করে পায়ের নীচের বা হাতের নাগালের একটা ডাল নেড়ে দেয়। তাতে কাঁচা পাকা যে সব জাম তলায় পড়ে ধুলো মেখে অখাদ্য হয়ে যায়, তাই কুড়োবার জন্য এই নিস্তব্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন নিত্য তারা কোলাহলে মুখরিত ক'রে তোলে। বারণ করলে তারা শোনে না—ধমক দিলে তখই চলে যায় বটে কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে আবার ফিরে আসে ও নিঃশব্দে ইঁদিতে ইসারায় কাজ আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে চাপা গলার আওয়াজ ও সতর্ক চাপা গলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় ও শেষে জামতলা আবার তেমনি গুলজার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তখন আবার ধমক দিতে মমতা হয়।

প্রতিবারই এই রকম হ'য়ে আসচে। এবার জাম নাবি, এখনো তাতে ভাল পাক ধরেনি। এখন থেকে গাছের ওপর নিত্য এই উপদ্রব চললে পাকবার আগেই জাম নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই একবার মনে করলাম উঠে একটা তাড়া দিই কিন্তু আবার ভাবলাম তাতেই বা লাভ কি? জামতলায় ত পাহারা বসাতে পারব না।

শেষে পাশফিরে শুয়ে আবার ঘুমের সাধনা করাই সমধিক লোভনীয় মনে হল, কিন্তু গোলমালে ভাল ঘুম হল না যদিও সে আশা একেবারে ছাড়তেও পারা গেল না। সেই আধঘুম আধজাগার অবস্থায় বেকার মন যে কখন জামতলার বিচিত্র কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে পড়েচে বুঝতে পারি নি—আড়ি, ভাব, আবদার অভিমানের আভাষ কানে আসছিল এবং এবং বোধ হয় ভোলা যায় না এমন সব দিনের কথা মনে জাগিয়ে তুলছিল ব'লে ভালও লাগছিল।

শেষে হঠাৎ কান্নার শব্দে চমক ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তম্ভিত ভাব ও পরক্ষণেই ঘোরতর কোলাহল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলাম—তিনচার বছরের মণ্টু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদচে এবং পাশে দাঁড়িয়ে তার দিদি খেঁদী অন্য সকলের সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করচে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েচে রে?

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ছেলে মেয়ের দল একবাক্যে নালিশ করলে—খেঁদী মিছিমিছি মণ্টুর গালে চড় মেরেচে—মা'র সামান্য হলেও মনে হল মারামারিটা ভাল নয় তাই ভাবলাম একটু শাসন করে দেওয়া দরকার। অতঃপর গম্ভীরভাবে খেঁদীর দিকে চেয়ে বললাম—

"ওকে মেরেচিস কেন"? খেঁদী কোন উত্তর করল না বরং যেন বেশ করেচে এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে আমি চেঁচিয়ে আবার বললাম—"তুই ও'কে মারলি কেন"—বল শিগ্‌গীর—

এবার খেঁদী কথা কইল কিন্তু সে প্রায় নিজের সঙ্গে। শুধু আমার ধমক শুনে অন্য সকলে একেবারে চুপ করেছিল বলেই আমি শুনতে পেলাম খেঁদী বলচে—কেন ও কাঁচা জাম খা'বে কেন?

কাঁচা জাম খেয়েচে? তা তোর ভাইকে তুই কোন দুটো ভাল জাম কুড়িয়ে দিলি? "ছেলেমানুষ কি হুটোপুটির মধ্যে—ওরে দেবার জন্যেই ত আমি কুড়োচ্ছি নয়"—

ছেলেরা কেউ কেউ ব'লে উঠল—না অনিল দাদা, ভাল ভাল জাম ও নিজেই কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

শুনে যুদ্ধং দেহির ভাবে তাদের দিকে ফিরে খেঁদী ব'লে উঠল—বেশ্ করেচি খেয়েচি—তোদের কি? আমার জাম আমি খেয়েচি—আমার ভাইকে আমি মেরেচি। বেশ করেচি—

আবার ঝগড়া করতে বসল—আরে মোল যা! যা সব তোরা এখান থেকে চ'লে যা। ফের যদি আজ জামতলায় আসবি ত দেখবি মজা—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সকলে আস্তে আস্তে চলে যাচ্চে আর শুনলাম গালদুটো ফুলিয়ে মণ্টু দিদিকে শাসাচ্চে—মা'কে আমি ব'লে দেব কিন্তু। তার কান্না ইতিমধ্যে থেমে গিইছিল।

শুয়ে শুয়ে বিচারকের বিড়ম্বনার কথা ভাবতে ভাবতে বেলা প'ড়ে এল। মুখহাত ধোবার জন্য উঠে অন্যমনস্ক ভাবে পেছনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম জামতলা নিস্তব্ধ শুধু একধারে

মণ্টু মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্চে আর ঘুমন্ত ভাইটীর মুখের ওপর থেকে পড়ত-রোদ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে খেঁদী নিজ অঞ্চল বীজনে মাছি তাড়াচ্চে।

আমার তখন মনে পড়ে গেল এরা ভাইবোন—এতক্ষণ যে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রবোধ ঘোষ।